ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪৩, ১৪৩২/২০২৫, ২১৯-২৩৬
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4312

রোহিঙ্গা সংকট : বাংলাদেশে নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা

ড. মোঃ মোরশেদুল আলম
অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: The Rohingya refugee crisis continues to be one of the biggest human-made humanitarian disasters of the 21st century. Because of this, Bangladesh is facing many challenges, such as social tensions, political effects, security issues, economic problems, and environmental damage. The country has suffered serious negative impacts, like more competition for jobs, higher prices for basic goods, lower daily wages, higher transport costs, environmental harm, greater risk of disease, and refugees getting involved in criminal behavior. The political attitude of Myanmar's leaders is especially important in solving the Rohingya crisis. The international community needs to rethink how it approaches finding a solution. International and regional organizations, including the United Nations, and world leaders must take an active role in stopping the crimes against humanity done by the Myanmar military government and helping return the Rohingya to their homeland. Solving the Rohingya crisis is a big challenge for Bangladesh, due to the influence and interests of powerful countries focused on Myanmar's Rakhine State. In particular, Myanmar's two main neighboring countries, China and India, need to take a more active role to push the Myanmar military government to accept fair demands for Rohingya repatriation. The Rohingya refugee crisis is no longer just a humanitarian issue; it now poses a serious threat to the internal security and stability of Bangladesh and could also be a larger threat to security in the Southeast Asian region. The ARSA militant group has already shown the ability to recruit Rohingya fighters from refugee camps for cross-border attacks and to smuggle weapons and drugs, which threatens law and order and security. Several radical groups, including the Rohingya Solidarity Organization (RSO), Arakan Islamic Front, and Rohingya Patriotic Front, that are active in the border areas between Bangladesh and Myanmar, involve Rohingyas in their activities. Since much of the security threat from Rohingyas and extremist groups is hidden and not easily detected, it seems there is likely a lot more activity happening than

is known, suggesting that the security challenge has not yet been fully understood or measured. The current research paper describes the security risks posed by the Rohingya crisis in Southeast Asia, including Bangladesh. At the same time, it analyzes the geopolitical challenges that Bangladesh faces in the repatriation of Rohingya. The paper also looks into possible ways the government can deal with the crisis, working together with international aid groups and non-governmental organizations.

Key Words: Rohingya refugees, Rohingya crisis, Bangladesh, Myanmar, Security threat, Repatriation, Geo-political challenges.

জাতিগত নিধন ও দমন-পীড়নের শিকার হয়ে[১] বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা ১২ থেকে ১৫ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশ আশ্রয় দিয়েছে।[২] একে জাতিসংঘ 'জাতিগত নির্মূলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ' বলে অভিহিত করেছে এবং অন্যান্য অধিকার গোষ্ঠীগুলো এটিকে 'গণহত্যা' হিসেবে উল্লেখ করেছে।[৩] মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের এতদিন ধরে আশ্রয় দিয়ে এলেও শুরু থেকেই তাদের নিরাপদে, টেকসই ও মর্যাদার সঙ্গে মিয়ানমারে ফেরত নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট জোরালো দাবি জানিয়ে আসছিল বাংলাদেশ। এই জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ, অর্থনীতিসহ আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নিরাপত্তা হুমকি শুধু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্যই নয়; বরং পুরো এশিয়া মহাদেশের নিরাপত্তাসহ বিশ্বজুড়ে সংকট তৈরি করছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘস্থায়ী উপস্থিতি একটি জটিল ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ২০১৭ সালের শেষদিকে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে রাজি হয়ে ওই বছর সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি করে মিয়ানমার। এরপর ২০১৯ সালে দুই দফা প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও রাখাইন রাজ্যের নিরাপত্তা পরিবেশ নিয়ে শঙ্কার কথা তুলে ধরে মিয়ানমারে ফিরতে রাজি হয়নি রোহিঙ্গারা। সেই থেকে এখন পর্যন্ত আটকে আছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন।[৪] মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্তের বেশির ভাগ অংশই কিন্তু রাখাইন। ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে মিয়ানমার সেনাবাহিনী দেশটির ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল।[৫] সামরিক বাহিনী অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পর থেকে দেশটিতে কার্যত গৃহযুদ্ধ চলেছিল। বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠী নিজ নিজ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিল। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৩৫ লক্ষের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।[৬] মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের রাখাইনে বসবাস সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যাবাসন এবং এ জনগোষ্ঠীর পক্ষে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই সমাধানে জাতিসংঘে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।[৭]

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের দুর্গম ও পাহাড়ি এলাকায় গড়ে ওঠা রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ পুরো এলাকাটি যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনি ব্যক্তি থেকে সামষ্টিক পর্যায়েও নিরাপত্তা ঝুঁকি

রয়েছে। অপরাধ কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে এলাকাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উদাহরণ হিসেবে ইয়াবার কথা বলা যায়। ইয়াবা পাচারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ৯২ শতাংশ রোহিঙ্গা এবং যার ৯৬ ভাগ ইয়াবা বাংলাদেশে প্রবেশ করে মিয়ানমার সীমান্তঘেঁষা টেকনাফ দিয়ে। মাদক পাচারসহ মানব পাচার, অস্ত্রযুদ্ধ, চরমপন্থা এবং সন্ত্রাসবাদ সবকিছু মিলিয়ে নিরাপত্তা ঝুঁকি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের জন্য। সীমান্তবর্তী হওয়ায় ক্যাম্পগুলোকে আন্তঃসীমান্ত যুদ্ধ এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারেরও ঝুঁকি রয়েছে।[৮] বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শিবিরে অপরাধের হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। রোহিঙ্গা শিবিরে অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত এরকম অন্তত ১৪টি দল সক্রিয় রয়েছে।[৯] তাদের যাতে শনাক্ত করা না যায় সেজন্য ওয়াকি-টকি এবং মিয়ানমার পোস্ট অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস (এমপিটি) সিম কার্ড তারা ব্যবহার করছে। মিয়ানমারে সামরিক দমন-পীড়নের পর এবং কক্সবাজার ক্যাম্পে অবস্থানরত অপরাধীদের চাপে পড়ে হত্যা, ধর্ষণ, চোরাচালান এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কাজের মুখোমুখি হচ্ছে সাধারণ রোহিঙ্গারা। তাছাড়া ক্যাম্পগুলোতে রোহিঙ্গা জনসংখ্যার ঘনত্বও উদ্বেগের কারণ। পর্যটনভূমি হিসেবে খ্যাত দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার রোহিঙ্গা শিবির থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সমুদ্রসৈকত ইনানী থেকে কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের দূরত্ব মাত্র সাড়ে সাত মাইল। আর কুতুপালং থেকে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের দূরত্ব মাত্র ১.৮৬ মাইল।[১০] পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে কোনো একটি অঘটন ঘটিয়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের দুর্গম পাহাড়ি এলাকা কিংবা ঘনবসতিপূর্ণ ক্যাম্পে লুকিয়ে থাকার সুবিধা রোহিঙ্গা শিবিরকে আরও ভয়ংকর করে তুলছে। ক্যাম্পের নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হয়েছে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন। এদের মোতায়েন করা হলেও তাদের পক্ষে অগোছালো ক্যাম্প ও সীমান্তবর্তী এলাকায় ঘনবসতি থাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা বেশ কঠিন। তাদের আগমনের ফলে মানবিক নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি তৈরি করছে। আন্তর্জাতিক মানবপাচার চক্রের রোহিঙ্গাদের প্রতি দৃষ্টি আছে। বেশির ভাগ রোহিঙ্গা পরিবারের মধ্যে কোনো পুরুষ সদস্য নেই। অধিকাংশই নারী ও শিশু। ফলে বিভিন্ন পাচারচক্র তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে বিদেশে যৌনকর্মী এবং শিশুশ্রমিক হিসেবে পাচার করছে। ২০২১ সালে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখা রোহিঙ্গাদের অন্যতম শীর্ষ নেতা মহিবুল্লাহকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়।[১১] ক্যাম্পে প্রত্যাবাসনের পক্ষে কাজ করা রোহিঙ্গা নেতারা সন্ত্রাসীদের মূল লক্ষ্য এবং তাদেরকে সুযোগ পেলেই পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হচ্ছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মাঝি বা নেতা ও স্বেচ্ছাসেবক যারা প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করে এবং প্রত্যাবাসনের পক্ষে কথা বলে তাদেরকে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা হত্যার জন্য টার্গেট করে। রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের কারণে ক্যাম্পে বসবাসকারী সাধারণ রোহিঙ্গারা আতঙ্কের মধ্যে থাকে। ক্যাম্পে মাদক-অপহরণসহ নানা অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহযোগিতা করলে কিংবা কোনো মামলার সাক্ষী হলেই সন্ত্রাসীরা সেসব রোহিঙ্গাদের টার্গেট করে। এতে করে বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয় তারা। আশ্রয় শিবিরগুলো পাহাড়বেষ্টিত হওয়ায় খুনিরা খুন করে সহজে আত্মগোপন করতে পারে।

অপরাধীদের বিষয়ে তথ্য প্রদান বা তাদের অপরাধ কার্যক্রমের জন্য কাউকে বাধা মনে করলে তাকেও প্রতিপক্ষ হিসেবে টার্গেট করে হত্যা করা হচ্ছে।[১২] ক্যাম্পগুলোতে প্রায় ৮০০ আখড়ায় মাদকদ্রব্য কেনাবেচায় জড়িত অন্তত পাঁচ হাজার রোহিঙ্গা। সীমান্তপথের ৩৩টি চোরাই পথ দিয়ে ইয়াবা ও আইসের বড় চালান ক্যাম্পে ঢুকছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর তথ্য মতে, দেশে বছরে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার মাদক আসে এবং এর ৭০ শতাংশ ইয়াবা। জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার মতে, যত মাদক বিক্রি হয় তার মাত্র ১০ শতাংশ ধরা পড়ে। বাংলাদেশে এখন প্রতিদিন ৭০ লাখ ইয়াবা বিক্রি হয়, যার আর্থিক মূল্য ২১০ কোটি টাকার মতো।[১৩] রোহিঙ্গা ক্যাম্পভিত্তিক বেশিরভাগ সন্ত্রাসী গ্রুপের সঙ্গে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের যোগাযোগ রয়েছে বলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার তথ্য রয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের এসব সংঘাত ও খুনোখুনির ঘটনার মাধ্যমে মিয়ানমার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে বোঝাতে চাচ্ছে যে, রোহিঙ্গারা উগ্র প্রকৃতির ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। ক্যাম্পগুলোতে ৩২টি সন্ত্রাসী গ্রুপ ও উপগ্রুপ সক্রিয় এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে করেন মিয়ানমার থেকে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। কারণ মিয়ানমার চায় না যে, রোহিঙ্গারা সংঘবদ্ধ হোক। কারণ এর ফলে প্রত্যাবাসনের জন্য চাপ তৈরি হবে ও রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফিরে যেতে চাইবে। বিশ্ববাসীর নিকট রোহিঙ্গাদের সন্ত্রাসী হিসেবে তুলে ধরা, আন্তর্জাতিক আদালতে চলমান রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচার প্রক্রিয়াকে ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করা এবং রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বাধাগ্রস্ত করাই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য।[১৪]

আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিকরা বাংলাদেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশ্রয়প্রাপ্ত এসকল রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে আহ্বান জানালেও মিয়ানমার তাতে সাড়া দেয়নি। এই মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিজেদের নাগরিক বলেও অস্বীকার করে আসছে মিয়ানমার।[১৫] মিয়ানমার থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা রোহিঙ্গা হিসেবে পরিচিত হলেও বাংলাদেশ সরকার তাদের রাখাইন প্রদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করে। রোহিঙ্গাদের কারণে শুধু স্থানীয় পর্যায়ে পর্যটনের পরিবেশ বিপর্যয় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় হচ্ছে বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। এটি সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের জন্যও ঝুঁকি।[১৬] রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নিরাপদে ও মর্যাদার সাথে প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় এবং জাতিসংঘসহ অন্যান্য অংশীজনদের নিয়ে আলোচনা সত্ত্বেও এখনো তাদের মাতৃভূমিতে ফেরত পাঠানো যায়নি। মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সশস্ত্র সংঘাত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনকে আরো দুরূহ করে তুলেছে। এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি, পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। এ পরিস্থিতি উগ্রবাদকেও ইন্ধন দিচ্ছে। এ সংকট প্রলম্বিত হতে থাকলে তা এই উপমহাদেশসহ বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ওপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।[১৭] রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আধিপত্য বিস্তার, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, অপরাধ সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণসহ নিজেদের মধ্যে হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে রোহিঙ্গাদের একটি অংশ। এর প্রধান কারণ হলো: প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব, আর্থিক লেনদেন,

প্রতিবেশী দেশের গোয়েন্দা সংস্থার উসকানি, মানসিক অস্থিরতা, চাঁদাবাজি, অপহরণ, নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব, যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, বেকারত্ব, মাদক ব্যাবসা, মানব পাচার, অবৈধ অস্ত্র ব্যাবসা নিয়ে দ্বন্দ্ব, জঙ্গি সংগঠনের কর্তৃত্ব নিয়ে টার্গেট কিলিং, বাদী হয়ে মামলা দায়ের, মামলার সাক্ষী হওয়া, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে সহায়তা করা প্রভৃতি। ইয়াবা ও আইসের কারবার নিয়ন্ত্রণ এবং মাদকের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে আশ্রয়শিবিরে সশস্ত্রগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায়ই গোলাগুলি, খুন ও অপহরণের ঘটনা ঘটছে। প্রত্যাবাসনের বিলম্বের কারণে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়েই চলেছে। বিগত ৬ বছরে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে অস্ত্র, মাদক, ধর্ষণ, অপহরণ, ডাকাতি, পুলিশের ওপর হামলা, হত্যা ও মানব পাচারসহ নানা অপরাধে মামলা হয়েছে।[১৮] মিয়ানমারে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াজুড়ে অপরাধ ও মানব পাচারের ঘটনা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকিতে পরিণত হচ্ছে। মিয়ানমার ও বাংলাদেশের উপকূল থেকে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ায় রোহিঙ্গাদের মানব পাচার এখন গুরুতর সমস্যা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালের শুরু থেকে ২০২২ সালের ১৫ জুন পর্যন্ত কক্সবাজারের সীমান্ত ক্যাম্পসহ রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় বিভিন্ন সময়ে অভিযান পরিচালনা করে ৪,০৪৮টি দেশি-বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এসব আগ্নেয়াস্ত্রসহ তিন শতাধিক রোহিঙ্গা ডাকাতকে আটক করা হয়েছে; যাদের বেশির ভাগই ক্যাম্পের বাসিন্দা। ৮-এপিবিএন পুলিশ জানায়, ২০২৪ সালে ক্যাম্প থেকে আমেরিকার তৈরি অত্যাধুনিক এম-১৬ রাইফেলসহ বিভিন্ন ধরনের ২৩০টি অস্ত্র এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। সীমান্তের ওপার দিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে বিভিন্নভাবে অস্ত্র ঢুকছে। সন্ত্রাসীরা এসব অস্ত্র মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজিসহ প্রভাব বিস্তারে ব্যবহার করছে। মূলত ক্যাম্পে নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত ভলান্টিয়ার সিস্টেম ভাঙতে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের ব্যবহার করছে।[১৯] স্থানীয়রা জানান, টেকনাফ ও উখিয়া মিলে বর্তমানে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বসবাস করছে। অথচ এই দুই উপজেলায় স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা পাঁচ লাখের মতো।

রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের জন্য বহুমাত্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত হুমকি সৃষ্টি করছে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পাশাপাশি এ অঞ্চলে বহুজাতিক নিরাপত্তা ঝুঁকিও রয়েছে। রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জঙ্গি সংগঠন এবং পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য ও লন্ডনভিত্তিক কট্টরপন্থি ইসলামিস্ট সংগঠনগুলোর সংযোগ ১৯৭৮ সাল থেকে। রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী সংগঠনের হাত ধরে চোরাচালানের মাধ্যমে আসা অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জঙ্গি সংগঠন এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের হাতে এসেছে এমন সন্দেহ পোষণ করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবিরে আরসা, রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও), ইসলামি মাহাজ, জমিওয়াতুল মুজাহিদানসহ আরো কয়েকটি সন্ত্রাসী সংগঠনের অবস্থান রয়েছে। মাদক, অস্ত্র চোরাচালান, মানবপাচার, ডাকাতি, ছিনতাইসহ সব ধরনের অপরাধে রোহিঙ্গারা জড়িত। রোহিঙ্গাদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করে গোষ্ঠীস্বার্থ অর্থাৎ অস্ত্র চোরাচালান, মানবপাচার, মাদক কারবার, চাঁদাবাজি ইত্যাদির মাধ্যমে বিপুল অর্থসম্পদের মালিক

হয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে। সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো নিজেদের হীনস্বার্থ চিরস্থায়ী করার জন্য কক্সবাজার থেকে রোহিঙ্গারা যেন মিয়ানমারে ফেরত না যায় তার জন্য সবরকম অপকর্মে লিপ্ত আছে। নিরাপত্তার হুমকিটি আরো বিপজ্জনক। কারণ স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন এবং প্রশাসনের অসাধু ব্যক্তিদের সহায়তায় রোহিঙ্গারা জাতীয় পরিচয়পত্র ও বাংলাদেশি পাসপোর্ট পেয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া স্থানীয় লোকজনের সাথে বিয়ের মাধ্যমে অনেক রোহিঙ্গা বাংলাদেশি নাগরিক হচ্ছে। ভৌগোলিকভাব 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল' এবং 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'-এর মাঝে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশ মানব পাচারের জন্য একটা আদর্শ রুট। একইভাবে এই অঞ্চল ক্ষুদ্রাস্ত্র পাচারের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চক্র প্রান্তিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মাদক ও ক্ষুদ্রাস্ত্র পাচারের বাহক হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। এতে করে নতুন মাদকচক্র এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গড়ে উঠছে। এর ফলে মাদক ও অস্ত্র আরও সহজলভ্য হয়ে উঠছে, যা আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।[২০]

মিয়ানমারের রাখাইনে ভারত, চীন, জাপান, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের ভূকৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে।[২১] একদিকে, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে চীনবিরোধী জোটের শক্তির মহড়া, অন্যদিকে রাখাইনে পরিবর্তিত ভূকৌশলগত গুরুত্ব প্রভৃতি কারণে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এখন আন্তর্জাতিক এবং মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ জান্তা সরকার বিরোধীদের রাজনীতির দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।[২২] এসব কারণে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া অপ্রতুল সম্পদ ও নানাবিধ সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আশ্রয় দেওয়া বাংলাদেশের পক্ষে অসম্ভব। সীমান্ত এলাকায় চলমান সশস্ত্র সংঘাতের পাশাপাশি রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে মানব পাচার, মাদক চোরাচালান, জঙ্গি কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন অপরাধের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। রোহিঙ্গা সংকটে জর্জরিত বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবে বিভিন্ন চেষ্টা করেও মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা এই জনগোষ্ঠীকে এখনো তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে পারেনি। এরইমধ্যে বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দেশটির সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর মধ্যে চলমান যুদ্ধাবস্থা নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মিয়ানমার থেকে বাড়তি প্রায় ৬০ হাজার মানুষের অনুপ্রবেশের ফলে মানবিক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।[২৩] এতে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার দুর্বলতা প্রকটরূপে ধরা পড়েছে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিবর্তনের ফলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এবং নতুন করে আরও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে ব্যাপক জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। রাখাইনে রোহিঙ্গা সংকটে বিভিন্ন বিশ্লেষক জাতিগত সংঘাত কিংবা ধর্মীয় বিদ্বেষকে দায়ী করলেও সংকটের নেপথ্যে বহুমাত্রিক কারণ খুঁজে পেয়েছেন রুশ বিশ্লেষকরা। এই সংকটের পশ্চাতে অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় দুই ধরনের কারণই রয়েছে বলে তারা মনে করেন। বড় বড় ভূ-রাজনৈতিক ক্রীড়নকরা এর সঙ্গে জড়িত বলে তারা ধারণা করেন। ওই বিশ্লেষকদের মতে, মিয়ানমারের মাটির নিচে থাকা প্রাকৃতিক সম্পদ সংকটের ভিত্তিমূল।[২৪] রুশ সংবাদমাধ্যম *স্পুটনিক*-এর রোহিঙ্গা সংকট সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে এইসব তথ্য উঠে এসেছে। 'ইনস্টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ অব দ্য

রাশিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেস'-এর সেন্টার ফর সাউথ ইস্ট এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং ওশেনিয়াবিষয়ক পরিচালক দিমিত্রি মোসিকায়ভ রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম 'আরটি'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, আন্তর্জাতিক ক্রীড়নকরা রোহিঙ্গা পরিস্থিতি আরও উসকে দিচ্ছে। মোসিয়াকভের মতে, রোহিঙ্গা সংকট অন্তত পক্ষে একটি ত্রিমাত্রিক ঘটনা। প্রথমত, এটি চীনবিরোধী একটি খেলা। কারণ আরাকানে (রাখাইন রাজ্য) চীনের বিশাল বিনিয়োগ আছে। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুসলিম উগ্রপন্থা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এমনটা করা হচ্ছে। তৃতীয়ত, আসিয়ানের মধ্যে অনৈক্য (মিয়ানমার ও মুসলিমপ্রধান দেশ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মধ্যে অনৈক্য) তৈরি করার প্রচেষ্টা এটি।[২৫]

রোহিঙ্গা ইস্যুটি আঞ্চলিক সংকটের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এতে করে এই অঞ্চলের অর্থনীতি, রাজনীতি ও নিরাপত্তায় এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়বে। প্রতিবেশী বড় দুই দেশ ভারত ও চীন মিয়ানমারের পক্ষ নিয়েছে।[২৬] অন্যদিকে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো সম্পর্ক না থাকায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোও মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছে না। আর এর সুযোগ নিচ্ছে দেশটি। রোহিঙ্গা সংকটটি বাংলাদেশের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট তৈরি করেছে। তবে এ সমস্যা এক দিনের নয়। এর বিভিন্ন জটিল দিক রয়েছে। প্রাকৃতিক ও খনিজসম্পদসমৃদ্ধ দেশটির ক্ষমতার প্রধান অংশীদার সেনাবাহিনী। আন্তর্জাতিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর রয়েছে বহুমুখী প্রতিযোগিতা ও স্বার্থ। এছাড়াও ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও আদর্শগত দ্বন্দ্ব রয়েছে। কর্তৃত্ববাদী শাসন, ধর্মীয় নিধন ও প্রাকৃতিক সম্পদ এ সংকটের বিভিন্ন প্রবণতা তৈরি করেছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘায়িত উপস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতি, পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। তাদের প্রত্যাবাসনের অনিশ্চয়তা সর্বস্তরে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি করেছে। মানবপাচার ও মাদক চোরাচালানসহ আন্তঃসীমান্ত অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২৭] মূলত চীন, ভারত ও রাশিয়ার ভূরাজনৈতিক স্বার্থে মিয়ানমারে ব্যাপক পরিসরে বিনিয়োগ রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে প্রধান অন্তরায়।[২৮] এই সংকটকে দীর্ঘায়িত করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকারের প্রতি কোনো দেশের সমর্থন না থাকলেও এশিয়ার অন্যতম দুটি শক্তিধর রাষ্ট্র এবং মিয়ানমারের দুই বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত ও চীনের সমর্থন রয়েছে। মিয়ানমারে চীনের যে স্বার্থ অন্য যে-কোনো দেশের তুলনায় ব্যাপক ও বিস্তৃত। ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চীনের নিকট মিয়ানমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। ২০১৩ সালে চীনের বিশ্বব্যাপী নতুন ভূকৌশলগত পরিকল্পনা 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে মিয়ানমার বঙ্গোপসাগরের তীর অঞ্চল রাখাইন (পূর্বের আরাকান) অঞ্চল বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।[২৯] মিয়ানমারকে ঘিরে চীনের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ এবং বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি।[৩০] দেশটির প্রকাশিত এক তথ্যে জানা যায়, এর পরিমাণ আনুমানিক ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; যা সবগুলো পশ্চিমা দেশের মোট বিনিয়োগের দ্বিগুণেরও বেশি। যদিও মিয়ানমারে চীনের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ কৌশলগত কারণে খুব গোপন। শুধু

গোলযোগপূর্ণ রাখাইনের সিতওয়ে শহরের 'শয়ে' গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস সঞ্চালন (শয়ে থেকে কুনমিং হয়ে চীনের গোঞ্জেহ প্রদেশ) পাইপ লাইন নির্মাণ ও তার নিরাপত্তার জন্য সেনানিবাস তৈরি ও আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প তৈরিতে বিনিয়োগ করেছে ২৫০ কোটি মার্কিন ডলার; যার সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন স্বয়ং মিয়ানমারের সেনাপ্রধান। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, চীন শুধু রাখাইনেই সবমিলিয়ে ১ হাজার ৮০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রকল্প চলমান রয়েছে।[৩১]

আবার ভারতের সঙ্গে মিয়ানমারের স্থল সীমান্ত সংযোগ রয়েছে। রাখাইন রাজ্য ভারতের জন্য ভূ-কৌশলগত স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে।[৩২] মিয়ানমারে ভারতের প্রভাব হ্রাস, ভারতকে কৌশলগতভাবে ঘিরে ফেলা এবং যেকোনো মূল্যে মিয়ানমারকে হাতে রাখা চীনের অন্যতম সামরিক কৌশল।[৩৩] রাখাইনের আকিয়াব সমুদ্রবন্দরে চীনের জ্বালানি তেলের টার্মিনাল তৈরি হচ্ছে; যার প্রকৃত উদ্দেশ্য তেল আমদানিতে মালাক্কা প্রণালির ওপর নির্ভরতা হ্রাস এবং ভারতমহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের একক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে নিজের সামরিক শক্তির আধিপত্যকে জানান দেওয়া।[৩৪] এজন্য চীন মিয়ানমারের নিকট থেকে নিজ স্বার্থ উদ্ধারে মরিয়া।[৩৫] চীন অবরোধের চার দশক ধরে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর নিকট সব ধরনের অস্ত্রের প্রায় একক বিক্রেতা। চীনের নির্মিত অস্ত্রই মিয়ানমার প্রতিরক্ষা খাতের প্রধান শক্তি। মিয়ানমারের সামরিক বাজারের ৯০ শতাংশই হচ্ছে চীনের দখলে। অস্ত্র উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, অস্ত্র প্রযুক্তি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সুইডেনভিত্তিক 'স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে, ১৯৮৮ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত কেবল চীনের নিকট থেকে ১৬৯ কোটি ডলারের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় করেছে মিয়ানমার। সুতরাং এত বড় অস্ত্রের বাজার চীন কখনোই হাতছাড়া করতে চাইবে না এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া চীনের বিরুদ্ধে এর সীমান্ত সংলগ্ন মিয়ানমারের কাচিন, সান, কোকাং অঞ্চলসহ কয়েকটি রাজ্য ও এলাকায় স্বাধীনতাকামীদের অর্থ ও অস্ত্র সহায়তা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মিয়ানমারকে বশে রাখতেই চীন এমন দ্বিমুখী কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে।[৩৬] কাজেই মিয়ানমারের নিরাপত্তার জন্য চীনকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যেমন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি চীনও তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে মিয়ানমারকে কৌশলে সর্বক্ষণ ছায়া দিয়ে চলেছে।[৩৭] ভূরাজনৈতিক স্বার্থে ভারতও মিয়ানমারের পক্ষ নিয়েছে।[৩৮] ভারতের স্বাধীনতাকামীদের আন্দোলন দমন, করিডর সুবিধা, ট্রান্সশিপমেন্ট প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করা হলেও মিয়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন ১ হাজার ৬৪৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনরত তিনটি রাজ্য মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামের বিদ্রোহ দমন করতে মিয়ানমারের সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারকে সমর্থন না করে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়ালে এ তিনটি রাজ্যের আন্দোলন দমন করা কঠিন হয়ে পড়বে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনরত সাতটি রাজ্য 'সেভেন সিস্টার্স'-এ পণ্য পরিবহণ, সামরিক সরঞ্জামাদি প্রেরণ ও সড়ক যোগাযোগের একমাত্র স্থলপথ 'চিকেন নেক' নামে পরিচিত শিলিগুড়ি করিডর।[৩৯] মাত্র ১৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই করিডরটি কৌশলগত কারণে ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চীন-ভারত যুদ্ধ হলেই এই

করিডরটি দখল করে নিতে চীন চেষ্টা করবে।[৪০] সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে পণ্য পরিবহণ ট্রানজিটও যদি ব্যবহার করতে না পারে তবে ভারতের পক্ষে সেভেন সিস্টার্স-এর নিয়ন্ত্রণ হারানো অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই বিকল্প হিসেবে ভারত মিয়ানমারের ভেতর দিয়ে কালাদান নদী ব্যবহার করে রাখাইনের রাজধানী সিতওয়ে থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরামের মধ্য দিয়ে লম্বা একটি 'মাল্টিমোড আল' বা বহুমাত্রিক যোগাযোগ স্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা কালাদান মাল্টিমোডা ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট নামে পরিচিত।[৪১] ভারতের সার্বভৌমত্ব হুমকি মোকাবিলায় হাতে নেওয়া এই প্রকল্পে ভারত এরই মধ্যে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ছাড় করেছে। এই প্রকল্পে কলকাতার হালদিয়া বন্দরের বিভিন্ন পণ্য সরাসরি সিতওয়ে বন্দরের মাধ্যমে ভারতের সেভেন সিস্টার্সে পৌঁছানো সম্ভব। অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে মিয়ানমারের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হতে সিতওয়ের কাছে স্পেশাল ইকোনমিক জোন গঠনের প্রকল্প নিয়েও ভারত এগিয়ে গেছে।

রোহিঙ্গা অধ্যুষিত ভারতীয় সীমান্তসংলগ্ন উত্তর রাখাইন যেহেতু ভারতের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে যে-কোনো বিশৃঙ্খলা ভারতের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা মোকাবিলায় কৌশলগত কারণেই ভারত মিয়ানমারের পাশে দাঁড়িয়েছে। নিরাপত্তা ও সামরিক কৌশলগত কারণে মিয়ানমারে চীনের আধিপত্য কমাতে ভারত তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে 'অ্যাক্ট ইস্ট প্রকল্প'-এর আওতায় ভারত-মিয়ানমার-থাইল্যান্ড যোগোযোগ স্থাপনের কাজও এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। তাছাড়া ভারত কিছু সমরাস্ত্র তৈরি করেছে। অস্ত্র বিক্রির বাজারের খোঁজে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী, সেনা-নৌবাহিনীর প্রধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমার সফর করেছেন। এই দুটি দেশ বেশ কয়েকটি সামরিক সহযোগিতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। 'স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিচার্স ইনস্টিটিউট'-এর এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারত ২০০৫ সালে মিয়ানমারের নিকট প্রথমবারের মতো অস্ত্র বিক্রি করেছিল। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার মুখে মিয়ানমারের নিকট ভারতের অস্ত্র বিক্রির খবর জানাজানি হলে বেশ কয়েকটি দেশ ও সংগঠনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক হুমকির মুখে পতিত হয়েছিল। ভারত শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নেয় যে, অস্ত্র বিক্রি নয় বরং ভারত-মিয়ানমার অভিন্ন সীমান্তে তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিরক্ষাবিষয়ক চুক্তিতে আবদ্ধ আছে। রাখাইনে চীন-ভারত ছাড়াও জাপান মিয়ানমারের ৫ম বৃহৎ লগ্নিকারী দেশ। মিয়ানমারে চীনের যে ভূরাজনৈতিক ও কৌশলগত প্রভাব রয়েছে, জাপানও অং সান সু চির সময়ে বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে প্রচুর অর্থ লগ্নি করেছে।[৪২] সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর রাশিয়া শুধু অর্থনৈতিকভাবেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার শাসনভার গ্রহণের পর দেশকে সোভিয়েত যুগে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই রাশিয়া মিয়ানমারমুখী হয়েছে। মিয়ানমারের উচ্চশিক্ষার বাজার ধরতে এবং কৌশলে প্রভাব বিস্তার করার নীতি হিসেবে মিয়ানমারের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাশিয়া বিশেষভাবে অবদান রাখছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৪ হাজার

৭০৫ জন শিক্ষার্থী রাশিয়ায় উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করেছেন; যাদের ৭০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেছেন কেবল পারমাণবিক বিদ্যায়। তাছাড়া রাশিয়ার সরকার মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীকে দীর্ঘদিন ধরেই উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। ২০১৫ সালে মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক অবরোধ উঠে গেলে রাশিয়া দেশটিতে বিনিয়োগ ও অস্ত্র বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ করে। ওই বছরই ৩০ বছর যাবৎ মিয়ানমারের অস্ত্র বাজারে চীনের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে রাশিয়া ভাগ বসায়। সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ, নব প্রযুক্তি ও প্রজন্মের অস্ত্রভান্ডার সমৃদ্ধকরণ এবং বিমানবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্বাধীনতাকামী আন্দোলন দমাতে বিমানবাহিনীর সহযোগিতা নেওয়া ইত্যাদি বহুবিধ কারণেই মিয়ানমার রাশিয়ার অস্ত্রের প্রতি মনোযোগ দেয়। 'স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর গবেষণা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ১৯৮৮ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত কেবল রাশিয়ার নিকট থেকে মিয়ানমার কমপক্ষে ৩৯ কোটি ৬০ লাখ ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে। অর্থের হিসেবে রাশিয়া মিয়ানমারের দ্বিতীয় অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ। এ অবস্থানটি একচেটিয়া করতেই রাশিয়া মরিয়া হয়ে উঠেছে। রাশিয়া শুধু মিয়ানমারের অস্ত্রের বাজারের দিকেই নজর দিয়েছে এমন নয়; বরং বিনিয়োগে অর্থ সহায়তা এবং প্রযুক্তি রপ্তানির দিকেও বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। এ লক্ষ্যে রাশিয়া মিয়ানমারের দুটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির চুক্তি করে ২০১৩ সালে, যার কাজ এরই মধ্যে চলছে। এছাড়া দেশটির বিপুল খনিজসম্পদ বিশেষ করে তেল ও গ্যাস আহরণে রাশিয়া এরই মধ্যে মিয়ানমারে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। মিয়ানমারের তেল-গ্যাসের ভান্ডারের মুনাফায় নিজের আধিপত্য রাখতে রাশিয়ার সরকারি কোম্পানি 'গাজপ্রম' রাজধানী ইয়াঙ্গুনে একটি অফিসও খুলেছে। তাই রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করার প্রতিযোগিতায় রাশিয়া কিছুতেই পিছিয়ে পড়তে চাইবে না।[৪৩] মিয়ানমারে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ যুক্ত রয়েছে। রাখাইনে একটি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মিত হয়েছে; যার ৮০ শতাংশ মালিকানা চীনের। এ বন্দর থেকে চীনের কুনমিং পর্যন্ত দুটি পাইপলাইন (একটি দিয়ে পেট্রোলিয়াম এবং অন্যটি দিয়ে গ্যাস) নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে চীনের জ্বালানি সরবরাহের প্রধান প্রণালি মালাক্কা কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে সেটিকে বাইপাস করে রাখাইনের এই গভীর সমুদ্রবন্দর দিয়ে চীন নিয়ে আসতে পারবে। এই সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে চীন বঙ্গোপসাগর ও ভারতমহাসাগরে প্রবেশের একটি দ্বার তৈরি করেছে। আবার যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলো যে ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলগত নীতি প্রকাশ করেছে, সেখানে বঙ্গোপসাগর ও ভারতমহাসাগর খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তাছাড়া রাখাইনের বিভিন্ন জায়গায় কিছু অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে; যার মালিকানা মূলত চীন ও রাশিয়ার। আবার চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অধীনে যে ৬টি অর্থনৈতিক করিডর স্থাপন করা হবে, তার মধ্যে দুটি নৌভিত্তিক। এর মধ্যে ১টি চীন-মিয়ানমার করিডর নামে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে তাদের প্রভাববলয় সৃষ্টির চেষ্টা করছে।[৪৪] রাশিয়াও এই প্রতিযোগিতায় রয়েছে। মিয়ানমারের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রেখে নিজেদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করছে দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুর। যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে বার্মা অ্যাক্ট প্রবর্তন করেছে। এই আইনের মাধ্যমে মিয়ানমার, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠীকে সহায়তা করতে

পারে। এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র বনাম চীনের কৌশলগত প্রতিযোগিতায় প্রভাব পড়বে।[৪৫] আবার রাখাইনের সিতওয়েতে ভারতের তৈরি করা গভীর সমুদ্রবন্দর এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলও আক্রমণের মুখে। শিলিগুড়ি করিডরের বিকল্প হিসেবে ভারত যে কালাদান প্রকল্প গ্রহণ করেছিল, তা এখন চীন সমর্থিত আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে। এতে করে রাখাইনে ভারত ও চীনের ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বও নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।

চীন মিয়ানমারের জান্তা সরকারকে সরাসরি সমর্থন দিয়ে আসছে, আবার একই সাথে বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। *টাইমস অব ইন্ডিয়া*'র প্রতিবেদনে বলা হয়, আরাকান আর্মি বেশিরভাগ অস্ত্র পাচ্ছে চীন থেকে।[৪৬] দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াভিত্তিক একটি সামরিক সূত্র জানায়, চীন আরাকান আর্মিকে ৯৫ শতাংশ অর্থায়ন করছে। মিয়ানমারের বর্তমান সংঘাতময় পরিস্থিতি বিশেষ করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুতে প্রচলিত দ্বিপক্ষীয় আলোচনা বা শুধু চীনের মধ্যস্থতা কোনো সুফল বয়ে আনবে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে শুধু দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার প্রচেষ্টা ও চীনের ওপর নির্ভরতা খুব একটা কাজে দিচ্ছে না; তাই কেন্দ্রের দাবিদার ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট (এনইউজি) ও আরাকান আর্মি তথা তাদের রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। একদিকে ভারতের সঙ্গে বাংলাদশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারেও যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে তাতে দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যেও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ফলে জটিল এক ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি বাংলাদেশ। রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একদিকে ভারতমহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে চীনবিরোধী জোটের শক্তির মহড়া, অন্যদিকে রাখাইনে পরিবর্তিত ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব প্রভৃতি কারণে রোহিঙ্গারা এখন আন্তর্জাতিক ও মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ জান্তাবিরোধীদের রাজনীতির গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মিয়ানমারের চলমান গৃহযুদ্ধ, রাখাইনে নতুন করে সংঘাত এবং বিদ্যমান রোহিঙ্গা সংকট মিলিয়ে বাংলাদেশের জন্য পুরো পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। একই সঙ্গে মিয়ানমারের রাখাইনকে ঘিরে ভূ-রাজনীতি এবং পরাশক্তিগুলোর স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকায় মিয়ানমারের সঙ্গে সংকট সমাধান বাংলাদশের জন্য বড় কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবেও সামনে এসেছে।[৪৭] রাখাইনে চীন, ভারত, রাশিয়া, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের যেখানে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ রয়েছে; রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুটি বাংলাদেশের জন্য সেখানে অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।[৪৮] বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক জটিলতায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বাধাগ্রস্ত। এই সংকট সমাধানে বহুমুখী কূটনৈতিক প্রচেষ্টার কোনো বিকল্প নেই। প্রত্যাবাসন নিয়ে চলমান অনিশ্চয়তার ফলে রোহিঙ্গাদের মধ্যে সৃষ্ট হতাশা এবং এর নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাখাইনে দ্রুত সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে টেকসই এবং স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসনের শুরু করা প্রয়োজন। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত বাংলাদেশকে সহযোগিতা করা। মিয়ানমারে শান্তি, নিরাপত্তা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের

জন্য আসিয়ান এবং অন্যান্য আঞ্চলিক পক্ষকে কাজ করতে হবে। রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে বিশ্বব্যাপী জনমত তৈরি হলেও মিয়ানমারের জান্তা সরকার তা আমলে নিচ্ছে না। ঐতিহাসিকভাবেই মিয়ানমার সরকার তার দেশ থেকে বের করে দেওয়া রোহিঙ্গাদের সেদেশে পুনরায় ঢুকতে না দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক কৌশলগুলো পরিবর্তন করতে হবে। আবার বিশ্ববাসী দেখেছে, জাতিসংঘে রোহিঙ্গা বিষয়ক প্রস্তাবে চীন ও রাশিয়া ভেটো প্রদান করে। এরপরও যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়াসহ সকল বৃহৎ শক্তিকে পাশে নিয়েই রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজে বাংলাদেশকে কাজ করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ নতুন বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ সংঘাতের দিকেই সরে যাচ্ছে; যা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনকে বিলম্বিত করছে। রোহিঙ্গাদের জন্য নাগরিকত্বের পথ সুগম করাসহ রাখাইন রাজ্য বিষয়ক কফি আনান উপদেষ্টা কমিশনের সুপারিশসহ সম্পূর্ণ বাস্তবায়নে ব্যাপকভিত্তিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।[৪৯]

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সংকটের প্রতি বিশ্বের মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে আর্জেন্টিনার ইউনিভার্সাল জুরিসডিকশন তথা সার্বজনীন বিচারব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়েছিল।[৫০] রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সংঘটিত ব্যাপকভিত্তিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে চলমান বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রেও আর্জেন্টিনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন, জাতিসংঘের ইনডিপেনডেন্ট ইনভেস্টিগেটিভ মেকানিজম ফর মিয়ানমার (আইআইএমএম)-এর প্রধান নিকোলাস কৌমজিয়ান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আইআইএমএমের কাজের পরিধি মিয়ানমারে শুধু রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে আর্জেন্টিনায় সর্বজনীন বিচারব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছিল। মিয়ানমারে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা কার্যকর হতে পারে।[৫১] মিয়ানমারে চলমান অভ্যন্তরীণ সংঘাত, রাখাইন রাজ্য আরাকান আর্মির দখলে নেওয়া এবং বিদ্যমান রোহিঙ্গা সংকট সবমিলিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের প্রতিকূলে। রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবিক সহযোগিতা হ্রাস পাওয়ায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের জন্য আরও বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশই সহায়তার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে যে অবস্থান নিয়েছে, তা পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলতে পারে।[৫২] মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ দিতে হবে। আসিয়ানের সীমাবদ্ধতা থাকলেও রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সদস্য রাষ্ট্রগুলো ভূমিকা রাখতে পারে। যদিও আসিয়ান সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না।[৫৩] কিন্তু রোহিঙ্গা সমস্যা এখন আর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়; আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলোকেও প্রভাবিত করছে। ২০২৪ সালের ১০ জুলাই জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের ৫৬তম অধিবেশনে

রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানের ওপর একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। গৃহীত প্রস্তাবটিতে রাখাইনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, রোহিঙ্গাদের বাস্তুচ্যুত করা এবং তাদের জোরপূর্বক বিভিন্ন সশস্ত্রবাহিনীতে নিয়োগের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। প্রস্তাবটি মিয়ানমারে যুদ্ধরত সকল পক্ষকে রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা দেওয়াসহ তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানায়। উক্ত প্রস্তাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যৌন অপরাধসহ সকল প্রকার নির্যাতন, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থায় আনা ও তদন্ত প্রক্রিয়া জোরদার করার প্রতি গুরুত্বরোপ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এবং আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে চলমান বিচার প্রক্রিয়াকেও সমর্থন জানানো হয়।[৫৪] গত সেপ্টেম্বর মাসে ৭৯তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) সপ্তাহব্যাপী উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইউএনজিএ'র তৃতীয় কমিটিতে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এক বার্তায় বলা হয়, ওআইসি ও ইইউ-এর যৌথভাবে পেশ করা 'মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার পরিস্থিতি' শীর্ষক প্রস্তাবটি এইএনজিএ'র তৃতীয় কমিটিতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। এ বছর অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে প্রস্তাবটি অন্যান্য দেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা মুসলিমসহ সকল শরণার্থীর প্রত্যাবর্তনের অধিকার নিশ্চিত করার এবং স্বেচ্ছায়, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ টেকসই প্রত্যাবর্তন ও পুনর্মিলনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি তৈরি করতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। এতে হত্যা, ধ্বংস ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, মানবিক সহায়তা প্রবেশে বাধা, শিশুসহ বেসামরিক নাগরিক বিশেষ করে রোহিঙ্গা মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জোরপূর্বক সশস্ত্রবাহিনী অথবা সশস্ত্র গ্রুপে নিয়োগসহ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অপব্যবহারের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। প্রস্তাবটিতে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য সমস্ত দায়বদ্ধতা প্রক্রিয়াকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। প্রস্তাবটি একটি আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে আসিয়ানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর প্রদান করে এবং সম্পূর্ণভাবে পাঁচ দফার ঐকমত্যের উদ্যোগগুলোকে তুলে ধরা হয়।[৫৫] এদিকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে উচ্চপর্যায়ের সম্মেলন আয়োজন করেছে জাতিসংঘ। মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের স্বেচ্ছায়, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনসহ সংকটের টেকসই সমাধানের জন্য একটি ব্যাপক, উদ্ভাবনী, সুনির্দিষ্ট ও সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রস্তাব করার জন্য ওই সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল সামগ্রিক সংকট পর্যালোচনা করা।

রোহিঙ্গাদের নিজদেশ মিয়ানমারে স্বেচ্ছায় ও নিরাপদ প্রত্যাবাসন ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতকল্পে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। রোহিঙ্গারা যেন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করে তাদের নিজ ভূমি রাখাইনে ফেরত যেতে পারে। রোহিঙ্গা সমস্যার উৎপত্তি যেহেতু মিয়ানমারে, তাই এর সমাধানও মিয়ানমারের নিকট রয়েছে। মিয়ানমার জান্তা সরকার বারবার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।[৫৬] এখন পর্যন্ত মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে সংকট নিরসনে কোনা কার্যকর পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর ধর্মীয় এবং জাতিগত দমন-পীড়ন বন্ধে

মিয়ানমার সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে।[৫৭] বিশ্ববাসী এখন উদ্ভূত নতুন নতুন সংঘাত প্রত্যক্ষ করছে এবং দুর্ভাগ্যবশত রোহিঙ্গা সংকটের রাজনৈতিক সমাধান ও এর ক্রমবর্ধমান মানবিক চাহিদা মেটানো দুটো থেকেই বিশ্বের মনোযোগ হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাতসহ বৈশ্বিক অন্যান্য সাম্প্রতিক সংঘাতের ডামাডোল এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুটি এখন অনেকটা গৌণ হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ ২০১৭ সালে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তদারকিতে রোহিঙ্গাদের জন্য একটি নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রদান করেছিল। কিন্তু সে সময় ভারতের অসম্মতির কারণে তা আর আলোর মুখ দেখেনি। রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ অঞ্চল কেবল জনগোষ্ঠীটির অনিশ্চিত, অনিরাপদ, আশাহীন জীবনের অবসান ঘটাবে তা নয়; একই সঙ্গে তা বাংলাদেশের নিজের জন্য এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্যও সবচেয়ে বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ বলে মনে করি। তবে নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হলো চীন ও ভারত। এই নিরাপদ অঞ্চলের ধারণাটি পশ্চিমা বিশ্ব তথা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নিকট স্বীকৃত হতে হবে।[৫৮]

নানা কূটনৈতিক জটিলতায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টি আটকে আছে। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বহুমুখী কূটনৈতিক তৎপরতা জরুরি। মিয়ানমার ও রাখাইন রাজ্যে যুদ্ধ বন্ধে এবং স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রগুলোকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা দেশগুলোর সহায়তায় রোহিঙ্গাদের রাখাইনে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে আরাকান আর্মি, সেখানকার অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্থানীয় রাখাইনদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এই সংকট সমাধানে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাশের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। সংকট সমাধানে বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য দেশগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবে চাপ প্রয়োগ এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে অবিলম্বে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বিশেষ করে এ ইস্যুতে চীন, রাশিয়া ও ভারতের সমর্থন বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সংকট সমাধানে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সংস্থা আসিয়ানের নিকট তাদের ফোরামে রোহিঙ্গা ইস্যুকে এজেন্ডাভুক্ত করার প্রস্তাব করেছে। এটিও নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। কারণ, আঞ্চলিক চাপ জোরদার ব্যতিরেকে শুধু বৈশ্বিক আলোচনার মাধ্যমে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সম্ভব নয়। পাশাপাশি মিয়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাও বাংলাদেশকে অব্যাহত রাখতে হবে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ব্যর্থ হওয়া মানেই আরও দীর্ঘ মেয়াদে তা আটকে যাওয়া। প্রত্যাবাসন ইস্যুতে কোনো গোষ্ঠী যাতে পরিস্থিতি জটিল করতে না পারে সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. বিস্তারিত দেখুন: জামাল উদ্দিন, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, (চট্টগ্রাম: বলাকা প্রকাশন, ২০২৩), ২৪৪-২৫৫; Maung Zarni, 'Myanmar's step-by-step approach toward Rohingya genocide and ethnocide', Mohammad Mohibullah Siddiquee (ed.), *The Rohingyas of Arakan History and Heritage*, (Chittagong: Ali Publishing House, 2014), 495-499.

২. K. K. Chattoraj, 'Rohingya Issue: Changing nature of geopolitical situation and diplomatic relationship among South-East Asian countries', *The Research Journal of Social Sciences*, 9 (1), 2018, 61-66. https://www.researchgate.net/publication/392085560_Rohingya_Issue_Changing_Nature_of_Geopolitical_Situation_and_Diplomatic_Relationship_Among_South-East_Asian_Countries, [Accessed on: 30 September, 2025].

৩. Eleanor Albert and Lindsay Maizland, "The Rohingya Crisis", https://www.cfr.org/backgrounder/rohingya-crisis, [Accessed on: 12 June 2024].

৪. *দৈনিক যুগান্তর*, ১২ জুলাই ২০২৪।

৫. *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩১ জানুয়ারি ২০২৪।

৬. *দৈনিক যুগান্তর*, ২২ জুলাই ২০২৫।

৭. *দৈনিক সমকাল*, ১০ জুলাই ২০২৪।

৮. Imtiaz Ahmed (ed.), 'Refugeehood and the State of Insecurity', *The Plight of the Stateless Rohingyas*, Third impression, (Dhaka: University Press Limited, 2019), 67-85.

৯. *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ জুন ২০১৯।

১০. *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১৭ নভেম্বর ২০২১।

১১. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ জুন ২০২২।

১২. Imtiaz Ahmed (ed.), *op.cit.*, 67-85.

১৩. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ জুন ২০২৫।

১৪. Imtiaz Ahmed (ed.), *op.cit.*, 67-85.

১৫. Abdul Karim, *The Rohingyas: a short account of their history and culture*, (Dhaka: Jatiya Sahitya Prakash: 2016), 101.

১৬. Shakhawat Hossain Shamim, *Rohingya Refugee Crisis: Myth, Mystery and Geopolitics*, (Dhaka: Darikoma Publication, 2021), 83-89.

১৭. Imtiaz Ahmed (ed.), *op.cit.*, 67-85.

১৮. Shakhawat Hossain Shamim, *op.cit.*, 83-89.

১৯. *দৈনিক সমকাল*, ২৮ জুন ২০১৯।

২০. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৫ এপ্রিল ২০২৫।

২১. Akkas Ahamed and others, 'Bangladesh-Myanmar Border Relations: A Study of Some Geopolitical and Economic Issues', *European Scientific Journal*, vol. 16, No. 22, 2020, 320–351. https://www. researchgate.net/ publication/

343988546_Bangladesh-Myanmar_Border_Relations_A_Study_of_Some_Geopolitical_and_Economic_Issues, [Accessed on: 30 September, 2025].

২২. 'Rohingya crisis being prolonged by geopolitics', https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/rohingya-crisis-being-prolonged-geopolitics 3754056, [Accessed on: 19 July 2025].

২৩. *দৈনিক যুগান্তর*, ২২ ডিসেম্বর ২০২৪।

২৪. Kunal Devnath and others, "Natural Resources and Ethnic Conflict: A Geo-strategic Understanding of the Rohingya Crisis in Myanmar", https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09735984221120309, [Accessed on: 11 July 2025].

২৫. *দৈনিক যুগান্তর*, ২৩ নভেম্বর ২০২১।

২৬. Md. Nazmul Houda, 'The Genesis of the Rohingya Crisis and Role of International Actors : Possible Sustainable Solutions', *Journal of Humanities And Social Science*, Volume 25, Issue 12, Series 4, December 2020, 1-2. https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.25-Issue12/Series-4/A2512040108.pdf, [Accessed on: 30 September 2025].

২৭. বুলবুল সিদ্দিকী ও ইশরাত জাকিয়া সুলতানা (সম্পা.), *রোহিঙ্গা শরণার্থী-জীবন: অনিশ্চিত আগামী ও সভ্যতার দায়*, (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০২১), ৮৮-৮৯।

২৮. Heba al-Adawy, 'Persecution of the Rohingya-the darks side of development in Myanmar', *Regional Studies*, XXXI (4), 25 September 2013, 2013, 43-65. https: //www. researchgate.net/ publication/ 333784340_DissertationSGIA40560_The_Plight_of_the_Rohingya_Refugees_A_Critical_assessment_of_the_Role_of_the_states_of_Myanmar_and_Bangladesh_and_the_International_Community, [Accessed on: 30 September 2025].

২৯. Dana Rice, 'An Overview of China's Belt and Road Initiative and Its Development Since 2013', https://www.researchgate.net/publication/366155235_An_Overview_of_China%27s_Belt_and_Road_Initiative_and_Its_Development_Since_2013, [Accessed on: 11 May 2025].

৩০. A. B. M. N. Sakib, 'Corruption and organized crime in Bangladesh', T. Wing Lo, Dina Siegel, Sharon Kwok (Ed.), *Organized crime and corruption across borders*, (London and New York: Routledge, 2019), 241-256.

৩১. R K Batra, 'Gas pipeline to China: Myanmar has it today; India had it 70 years ago', https://www.teriin.org/opinion/gas-pipeline-china-myanmar-has-it-today-india-had-it-70-years-ago, [Accessed on: 15 July 2025].

৩২. Md. Sirajul Islam, *Rohingya: Beyond the Border*, (Dhaka: Amar Prokashoni, 2018), 109-110.

৩৩. Bhumitra Chakma, 'The BRI and Sino-Indian Geo-Economic Competition in Bangladesh: Coping Strategy of a Small State', *Strategic Analysis*, 43(3), May 2019, 227-239. https://www.researchgate.net/publication/ 333597163_ The_

BRI_and_Sino-Indian_Geo-Economic_Competition_in_Bangladesh_Coping_Strategy_of_a_Small_State, [Accessed on: 11 May 2025].

৩৪. Neslihan Topcu, 'A Relationship on a Pipeline: China and Myanmar', https://www.chinacenter.net/2020/china-currents/19-3/a-relationship-on-a-pipeline-china-and-myanmar/, [Accessed on: 29 June 2025].

৩৫. Wai Yan Phyo Naing and Lin Sae-phoo, 'Northern Myanmar Poses a Challenge to China's Critical Minerals Strategy', https://thediplomat.com/2025/05/northern-myanmar-poses-a-challenge-to-chinas-critical-minerals-strategy/, [Accessed on: 11 July 2025].

৩৬. Brantly Womack, 'China and Southeast Asia: Asymmetry, Leadership and Normalcy', *Pacific Affairs*, 76 (4), December 2023, 529–548.

৩৭. United States Institute of Peace, 'China's Role in Myanmar's Internal Conflicts', https://www.usip.org/sites/default/files/2018-09/ssg-report-chinas-role-in-myanmars-internal-conflicts.pdf, [Accessed on: 22 June 2025].

৩৮. R. Mukherjee, 'India's stance on the Rohingya crisis: Between human rights and strategic interests', *Asian Journal of Political Science*, 28(3), 2020, 90-102.

৩৯. Ankit Panda, 'Geography's Curse: India's Vulnerable 'Chicken's Neck', https://thediplomat.com/2013/11/geographys-curse-indias-vulnerable-chickens-neck/, [Accessed on: 21 July 2025].

৪০. Dr. Rajbir Singh Dalal & Vinay Yadav, 'The Rohingya Crisis: A Humanitarian Disaster and its Impact on South Asia's Geopolitics', *Journal of Research in Humanities and Social Science*, Volume 13, Issue 1, 2025, 140-143.

৪১. Mohammad Safayat Hossain, "Natural Resources at Rakhine: Causes a Violation of the Human Rights of Rohingya Refugees in Myanmar?", file:///C:/Users/user/Downloads/5.UOSBK-C.1.pdf, 214.

৪২. মোহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম, *রোহিঙ্গা: নিঃসঙ্গ নিপীড়িত জনগোষ্ঠী*, (ঢাকা: প্রথমা, ২০২০), ১০০-১১৬।

৪৩. Ian Storey "Myanmar-Russia Relations Since the Coup: An Ever Tighter Embrace", https://fulcrum.sg/myanmar-russia-relations-since-the-coup-an-ever- tighter-embrace/, [Accessed on: 15 January 2024].

৪৪. Jürgen Haacke, 'The United States and Myanmar: From Antagonists to Security Partners?', https://www.researchgate.net/publication/291597362_The_United_States_and_Myanmar_From_Antagonists_to_Security_Partners, [Accessed on: 29 July 2025].

৪৫. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

৪৬. 'China Supplying weapons to Arakan Army armed group to weaken India Myanmar: Report', https://timesofindia.indiatimes.com/world/ china/china-supplying-weapons-to-arakan-army-armed-group-to-weaken-india-myanmar-report/articleshow/76741890.cms, [Accessed on: 18 June 2025].

৪৭. Iqthyer Uddin Md Zahed, 'Impact of the geopolitical status quo vis-à-vis the Rohingya crisis on the social, economic, and political aspects of Bangladesh', https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aspp. 12716, [Accessed on: 15 June 2025].

৪৮. Cchavi Vasisht, 'Japan's Economic and Geo-Strategic Interests in Myanmar', https://www.researchgate.net/publication/353702007_ Japan's_Economic_and_Geo Strategic_Interests_in_Myanmar, [Accessed on: 10 May 2025].

৪৯. জামাল উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, ২৯৫।

৫০. https://www.un.org/en/ga/sixth/77/universal_jurisdiction/argentina_ e.pdf, [Accessed on: 11 July 2025].

৫১. Nicholas Koumjian, 'Independent Mechanism for Myanmar', https://www.un.org/sg/en/global-leadership/independent-mechanism-for-myanmar/all, [Accessed on: 10 July 2025].

৫২. রাহমান নাসির উদ্দিন, *রোহিঙ্গা না রোয়াইঙ্গা: অস্তিত্বের সংকটে রাষ্ট্রহীন মানুষ*, (ঢাকা: মূর্ধন্য, ২০১৭), ১২০-১২৮।

৫৩. Azeem Ibrahim, *The Rohingyas: Inside Myanmar's hidden Genocide*, (New Delhi: Speaking Tiger: 2017), 133-134.

৫৪. HUMAN RIGHTS COUNCIL– 56th SESSION, 'Interactive dialogue on the progress oral report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar', https://gchragd.org/wp-content/uploads/2024/06/2024.07.04-HRC56-ID-with-the-SR-on-Myanmar-Geneva-Centre.pdf, [Accessed on: 12 June 2025].

৫৫. United Nations General Assembly, 'Scope, modalities, format and organization of the High-level Conference on the Situation of Rohingya Muslims and Other Minorities in Myanmar', https://docs.un.org/en/A/RES/79/278, [Accessed on: 23 May 2025].

৫৬. রাহমান নাসির উদ্দিন, *রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গার জীবন*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০২১), ১৩০-১৩৭।

৫৭. হোসেন আবদুল মান্নান, *রোহিঙ্গা: রাষ্ট্র সন্ধানী জাতি*, (ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০২০), ১৭২-১৭৮।

৫৮. মোহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, ১০০-১১৬।